মহাভারতের কালের কথা ও কাহিনী

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বিশ্বভারতীর বাংলাসাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

॥ জানকী বুক ডিপো । কলকাতা

নিবেদন

মহাভারতের মহাকাব্যের মধ্যে এমন অনেক কথা ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে, যাদের সঙ্গে মূল গল্পের কোন যোগ নেই। অথচ এই কাহিনীগুলি অবহেলার জিনিস নয়।

এদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে উপদেশপ্রধান। কতকগুলি সাহিত্যরসে ভরপুর, জীবনের ছোট ছোট সজীব ছবিতে সমৃদ্ধ। দু জাতের কয়েকটি বাছাই-করা উপকথা নিয়ে এই বইখানি রচনা করা হল।

এক কালে ভারতের ঘরে ঘরে রামায়ণ মহাভারত পড়া হত। লোকে ছোটবেলায় পড়ত, তরুণ বয়সে পড়ত, আবার বুড়ো বয়সেও পড়ত। মনে হয়, আজ আমাদের সমাজে রামায়ণ মহাভারতের সে আদর নেই।

অথচ রামায়ণ মহাভারতকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তি সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ যুগে যুগে এই দুখানি কাব্য থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষদের ছোট বড় সকলেই মূলতঃ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন।

ধর্মের ভাব নিয়েই যে মহাভারত পড়তে হবে—এমন কোন কথা নেই। এই বইখানিতে ছাপা উপকথাগুলি যেন সে যুগের সমাজের চলচ্চিত্র। এদের মধ্যে তখনকার লোকেদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, বল ও দুর্বলতা,—তাদের আদর্শ ও জীবনতত্ত্বের একটি সমগ্র ছবি চমৎকারভাবে পাওয়া যায়।

সাহিত্যরসে পুষ্ট এই ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার এতই মানবিকতায় ভরা যে, তা থেকে চিরন্তন মানুষের আশা ও বেদনার স্পর্শ পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে, এই উপকথাগুলি শুধু মহাভারতের কালের উপকথা নয়, তারা চিরন্তন মানুষের উপকথাও।

উপরন্তু, এই কাহিনীগুলির মধ্যে ধর্মজীবন এবং সংসারজীবন —দু রাজ্যেরই উপযোগী, প্রচুর, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং অনুভূতির কথা মণিমুক্তার মত পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তা পড়লে এ কালের অতি-আধুনিক মনও মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না।

আর একটি কথা। একদল সাহিত্যিক আছেন, তাঁরা মহাভারতের কাহিনীগুলিকে গম্ভীর ও সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষায় অনুবাদ করা শ্রেয় মনে করেন। আমি সে পথ অনুসরণ করি নি। আজ ঘরে ঘরে অতিসামান্য-লেখাপড়া-জানা, বহু নরনারী রয়েছেন, যাঁদের তৃষিত প্রাণ আকুল আগ্রহে মহাভারতের অমৃত পান করতে চায়। অথচ তাঁরা নতুন কালের মন নিয়ে কাশীরাম দাসের পদ্যে-লেখা মহাভারত পড়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন না। আমার সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে সেই অমৃতের সুরধুনীর কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্রোতধারাকে তাঁদের গণ্ডির মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছি। যাতে সমাজের বড় ছোট, উচ্চশিক্ষিত ও অতি-সামান্য শিক্ষিত, নবীন ও প্রবীণ একসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন, তার আশায় আমার লেখার ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাসম্ভব সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর করেছি।

এই বইখানির গল্পগুলি ঠিক অনুবাদ নয়। বাইরের দিক থেকে, বেশির ভাগ গল্পগুলির মধ্যে মূল ধারাকে যথাসাধ্য অনুসরণ করার এবং পুরাতন কালের পরিমণ্ডলকে বজায় রাখার চেষ্টা আছে। তবু, মূলতঃ তারা নতুন কালের মানুষদের জন্য নতুন করেই লেখা, বলা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্ততা মূল গল্পগুলির একটি প্রধান গুণ। আমি সেই মৌলিক গুণের যাতে হানি না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি। তাই অকারণে ভাষা বা প্লট কিছুই ফেনিয়ে বড় করার চেষ্টা করি নি।

"শ্রীনাথ নিবাস", কোন্নগর। স্বাঃ **কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়**

গল্পের তালিকা

বনবালা শকুন্তলা

মহাভারতের কালের কথা ও কাহিনী

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

দেবযানী, কচ আর যযাতি

শুক্র অসুরদের গুরু।

আর দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি। তাঁর একমাত্র ছেলে, নাম কচ।

এক সময়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভীষণ লড়াই বাঁধে। দুদলই তিন ভুবনের মালিক হতে চাইলেন। কিন্তু লড়ায়ে দেবতাদের বারবার হার হতে লাগল।

শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন। লড়ায়ে যেসব অসুররা মারা যেত, শুক্র তাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে বাঁচিয়ে তুলতেন।

কিন্তু দেবতারা সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন না। তাই মরা দেব-সেনাদের বাঁচানো যেত না। এর ফলে দেবতারা খুব কমজোর হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁদের মন দুর্ভাবনায় ভরে গেল।

শেষে দেবতারা সকলে মিলে গুরুপুত্র কচের কাছে এলেন। বললেন, তোমাকে স্বজাতির উপকারের জন্য একটা কাজ করতে হবে। অসুরদের দেশে গিয়ে

শুক্রাচার্যকে খুশী করতে হবে। তাঁর কাছ থেকে গুপ্ত সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে আসতে হবে। তুমি ছাড়া একাজ আব কারো সাধ্য নয়। তুমি যাও।

তরুণ কচ রাজী হলেন।

তিনি শত্রু-পুরীতে ঢুকে সোজা শুক্রের কাছে গিয়ে মিনতি করে জানালেন, ভগবান, আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আমার ইচ্ছে, আপনার কাছে হাজার বছর থাকি আর লেখাপড়া করি।

শুক্র যৌবনের আলোয় ভরা, শান্ত, সৌম ছেলেটিকে দেখে খুশী হলেন।

তিনি আশিস্‌ জানিয়ে বললেন, তুমি যতদিন খুশি আমার আশ্রমে থাক।

তারপর অসুরদের দেশে কচ বাস করতে লাগলেন। গুরুসেবা আর লেখাপড়া করে তাঁর দিনের পর দিন কাটে।

আশ্রমে থাকতেন গুরুর মেয়ে দেবযানী। পরমা-সুন্দরী। কচ দেবযানীকে খুব খুশী করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি সুযোগ পেলেই তাঁকে গান শোনাতেন। কখন-বা দূরের বন থেকে ফলফুল এনে দিতেন।

ক্রমে দেবযানীর মন পড়ল কচের উপর।

*

* *

একে একে পাঁচশ বছর এইভাবে কেটে গেল। অসুররা গোড়া থেকেই কচকে ভাল চোখে দেখেনি। একদিন তাদের মনে ঘোর সন্দেহ জাগল।

কচ সেদিন একাকী বনের ভিতরে আশ্রমের গরু চরাচ্ছিলেন। অসুররা নিরালায় পেয়ে তাকে ধরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। তারপর বনের যত শিয়াল কুকুরকে সেই মাংস খেতে দিলে।

—এতদিনে আমাদের দুশমনকে শেষ করেছি!— এই কথা ভেবে অসুরদের খুশির সীমা রইল না।

তখন ভর সন্ধ্যাবেলা। দেবযানী দেখলেন, বন থেকে গরুর পাল ফিরে এল। কিন্তু কচ এলেন না। তাঁর মন দুর্ভাবনায় ভরে গেল। শেষে তিনি উতলা হয়ে বাবার কাছে ছুটে এলেন।

শুক্র বললেন, মা, তুমি অত উতলা হয়ো না। এখনি কচকে আনিয়ে দিচ্ছি।

তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে ডাক দিলেন, কচ, কচ, তুমি যেখানেই থাক, আমার সামনে এসে হাজির হও।

সঙ্গে সঙ্গে কচ এসে উপস্থিত হলেন।

শিয়াল কুকুরদের পেট চিরে বার হয়ে আসতে কচের অসুবিধা হল না।

সঞ্জীবনী মন্ত্রের এমনই টান!

অসুররা কিন্তু হেরেও হার মানলে না। আবার একদিন সুযোগ পেয়ে তারা কচকে মেরে ফেললে।

দেবযানী আকুলবিকুল হয়ে আবার বাবার কাছে ছুটে এলেন।

শুক্র মেয়ের কষ্ট সইতে পারলেন না। তিনি পুনরায় গুপ্ত মন্ত্র পড়ে ডাক দিলেন, কচ, কচ।

কচ গুরুর পেটের ভিতর থেকে জবাব দিলেন, ভগবান, এই যে আমি।

শুক্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একি, তুমি আমার পেটের ভিতরে কেমন করে গেলে?

কচ জবাব দিলেন, আজ্ঞে, অসুররা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই মদের সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনার পেটের ভিতরে রয়েছি।

শুক্র মেয়েকে বললেন, মা, তুমি কাকে চাও—আমাকে না কচকে? কচকে বাঁচালে আমার পেট চিরে তাকে বাইরে আসতে হবে। তার ফলে আমার মরণ হবে।

দেবযানী কেঁদে ফেললেন। বললেন, বাবা, আপনাকে হারিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আবার কচকে হারিয়েও বেঁচে থাকতে পারব না। আজ আমার একি সর্বনাশ হল !

শুক্র মেয়ের ভালবাসার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি কচের উদ্দেশে বললেন, তুমি দেবযানীর মন পেয়েছ। দেবযানীর ইচ্ছে, তোমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করি। তাই আজ তোমাকে সে বিদ্যা দান করছি।

তারপর শুক্র একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললেন, শোন কচ, তোমাকে বাঁচাবার জন্য এখন মন্ত্র পড়ছি। মন্ত্র পড়া শেষ হলে তুমি আমার শরীরের ভিতর থেকে বার হয়ে আসবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি মারা যাব। তুমি কিন্তু বাইরে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলো।

তাই ঘটল।

কচ প্রাণ ফিরে পেলেন। তারপর তিনি নতুন-শেখা মন্ত্র পড়ে গুরুকে বাঁচিয়ে তুললেন।

অসীম খুশিতে কচের মন ভরে গেল। জীবনে আজ যে তিনি পেলেন আশার অতীত সিদ্ধি! যে বিদ্যালাভের জন্য শত শত বছর ধরে শত্রুপুরীতে সাধনা করছিলেন, তা আজ লাভ করলেন।

*

তারপর দিন কাটতে লাগল। ক্রমে হাজার বছর শেষ হল। কচ এবার গুরুর কাছে বিদায় নিলেন।

কিন্তু তিনি দেবলোকে যাত্রা করছেন, এমন সময় ঘটল অঘটন। দেবযানী পাগলিনীর মত ছুটে এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন, বললেন, তোমাকে যেতে দেব না।

কচ চমকে উঠলেন। অবুঝের ভান করে বললেন, কি বলছ তুমি, দেবযানী ?

দেবযানী বিবাহের কথা তুললেন ।

কচ মিনতি জানিয়ে বললেন, এ যে হয় না! তুমি আমার গুরুর মেয়ে, গুরুর মতই পূজনীয়া। তোমাতে আমাতে বিয়ে হতে পারে না।

দেবযানীর বুকে বাজল অসহ বেদনা। রাগে তিনি সাপিনীর মত হয়ে উঠলেন। কচকে শাপ দিয়ে বললেন, শোন, যে বিদ্যে পেয়ে তুমি আজ আমায় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ, সে বিদ্যে তুমি নিজে প্রয়োগ করতে পারবে না। এই শাপ দিলুম।

কচ হায়-হায় করে উঠলেন। বললেন, একি সর্বনাশ করলে, দেবযানী ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বলতে লাগলেন, আচ্ছা, বেশ। আমি নিজে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করতে নাই-বা পারলুম। আমি যাকে শেখাব, সে ত প্রয়োগ করতে পারবে? তাতেই হবে। কিন্তু আমিও তোমাকে শাপ দিই। জেনে রেখো, জীবনে কোন মুনির ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না।

কচের মন ভরেছিল স্বজাতির উপর ভালবাসায়। তিনি স্বজাতির সেবার জন্য দেবযানীর ভালবাসায় ধরা দিতে পারলেন না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সুরলোকে যাত্রা করলেন।

*

বাজের মত কঠিন সেই আঘাত। মনমরা দেবযানীর বুকে খুব বাজল। তাঁর ভিতরে সব আশা নিভে গেল। জীবনটা ঘন আঁধারে ভরে উঠল।

বছরের পর বছর এইভাবে চলে যায়।

হঠাৎ একদিন আবার মরা গাঙে জোয়ার লাগল। মহাকালের মায়ায় দেবযানীর ভিতরটা আবার নতুন আশায় ভরে উঠল।

বসন্তকাল। বনে বনে ফুটেছে অগুনতি ফুল।

দেবযানী একদিন এক সরোবরে নেমে জলখেলা করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা আর তাঁর সখীরা।

সেদিন ইন্দ্র সেই বনে ঘুরতে এসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল দেবযানীদের জলখেলা। তিনি তামাশা করার উদ্দেশে বায়ুরূপ ধরলেন। তারপর চুপিচুপি মেয়েদের কাপড়গুলো ঝড়ের মুখে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

জলখেলা শেষ হল।

মেয়েরা তীরে উঠলেন।

তখন কাপড় নিয়ে মহা হৈচৈ পড়ে গেল। হট্টগোলের ভিতরে যিনি যা পেলেন, তাই পরলেন। শর্মিষ্ঠা নিজের শাড়ী না খুঁজে পেয়ে পরলেন দেবযানীর শাড়ী।

দেবযানী জল থেকে উঠে এসে খুব রেগে গেলেন। শর্মিষ্ঠাকে বললেন, তুমি না অসুরের মেয়ে! তুমি ত আমার শিষ্যার মত। আমার কাপড় পরলে কোন্ সাহসে?

শর্মিষ্ঠা জবাব দিলেন, তোমার এত অহংকার! তোমার বাবা না আমার বাবার পুরুত? আমার বাবাকে খোশামোদ করাই ত তাঁর কাজ!

দেবযানী রাজকুমারীর কথা শুনে রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি শর্মিষ্ঠার গা থেকে শাড়ীখানি টেনে কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা করলেন।

তখন শর্মিষ্ঠা সজোরে তাঁকে ঠেলে পাশের কুয়োর ভিতরে ফেলে দিলেন। শেষে তিনি সখীদের নিয়ে সেখান থেকে রাজপুরীতে চলে গেলেন।

সেই বনে তখন মহারাজ যযাতি শিকার করতে এসেছিলেন।

তিনি ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে কুয়োর ধারে এসে হাজির হলেন।

—কে এখানে? আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। দেবযানী মানুষের সাড়া পেয়ে কুয়োর ভিতর থেকে কেঁদে উঠলেন।

যযাতি দেবযানীকে উদ্ধার করলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেবযানীর দাসী খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির হল।

দেবযানী কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলেন না। গোঁ ভরে বনের মধ্যে বসে রইলেন।

তখন দাসী ফিরে গিয়ে শুক্রকে ডেকে নিয়ে এল।

মেয়ে বাবাকে বললেন, হতভাগী শর্মিষ্ঠা আমাকে ভয়ানক অপমান করেছে। সে রাজার মেয়ে, আর

আমি নাকি খোশামুদে পুরুতের মেয়ে! এ অপমান সহে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার যে মরণই ভাল, বাবা।

গুরু শুক্র সব শুনে অখুশী হলেন। তিনি সোজা অসুরদের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, রাজা, তোমার মেয়ে আমার মেয়েকে ভয়ানক অপমান করেছে। এর পর আর আমি তোমার রাজ্যে থাকতে পারিনা।

—একি কথা বলছেন, ভগবান?

রাজা তখনি দেবযানীর কাছে ছুটে এলেন। বললেন, মা, তোমার কি চাই বলো। তাই দেব। কিসে তুমি খুশী হবে? তুমি গুরুদেবকে নিয়ে আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যেও না। আমার কথা শোন।

দেবযানী জবাব দিলেন, আমি আপনার রাজ্যে থাকতে পারি, যদি আপনার মেয়ে তার হাজার সখী নিয়ে আমার দাসী হতে রাজী হয়।

রাজা দেবযানীর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দেবযানী তা লক্ষ না করে বলে চললেন, হ্যাঁ, আর একটি কথা। বাবা যদি আমার বিয়ে দেন, তখনও দাসী হিসেবে শর্মিষ্ঠাদের আমার শ্বশুর-বাড়িতে যেতে হবে।

রাজা বললেন, বড় কঠোর তোমার আদেশ, মা। কিন্তু আমি তাতেই রাজী।

রাজার আদেশে রাজকুমারী হাজার সখী নিয়ে দেবযানীর দাসী হলেন।

তখন দেবযানীর রাগ পড়ল। তিনি বাবার আশ্রমে ফিরে এলেন।

*

* *

আরও কয়েক বছর কেটে গেল।

বনে বনে আবার বসন্তের দোলা লেগেছে। একদিন আবার দেবযানী আর তাঁর দাসীরা খেলা করছিলেন। কেউ ফুলের মধু খাচ্ছিলেন। কেউ গাছে উঠে ফুল তুলছিলেন। কেউ-বা গাছতলায় ঘুরে ঘুরে ফল কুড়ুচ্ছিলেন।

এমন সময় রাজা যযাতি হরিণ শিকার করতে করতে সেখানে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, একজন সুন্দরী মেয়ে আর একজন সুন্দরী মেয়ের পা টিপে দিচ্ছেন।

রাজা ত খুবই অবাক হয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

দেবযানী নিজেদের পরিচয় দিলেন। তারপর

জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আপনাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে, আপনি কোন দেশের রাজা।

যযাতি পরিচয় দিলেন।

তখন দেবযানীর মনে পড়ল পুরোতন দিনের কথা। তিনি ভাবলেন, ইনিই ত আমার হাত ধরে আমাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

দেবযানী বললেন, মহারাজ, আমার দাসীদের নিয়ে আমি আপনার শরণ নিলুম। আপনি আমাকে বিবাহ করুন।

যযাতি ভয় পেয়ে গেলেন। ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ কুমারীকে কেমন করে বিবাহ্ করবেন! এ যে অনাচার।

তিনি বললেন, দেবযানী, তোমরা জাতে ব্রাহ্মণ, আমি জাতে ক্ষত্রিয়। তোমার বাবার মত না হলে এ বিবাহ হতে পারে না। বিষধর সাপের চেয়ে ব্রাহ্মণের রাগ ভয়ংকর।

শেষে দেবযানী বাবার কাছে গিয়ে সব জানালেন।

শুক্র অপর কোন উপায় না দেখে রাজী হলেন। তিনি রাজার হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করে বললেন, মহারাজ যযাতি, তোমার হাতে আমার মেয়েকে সম্প্রদান করলুম। তুমি একে তোমার রানী করো। আমার বরে তোমার কোন পাপ হবে না। আর দেখো,

রাজকুমারী শর্মিষ্ঠাকে তোমার রাজপুরীতে নিয়ে যাও। তাকে খাতির করো। তবে যেন তাকে বিয়ে করো না। আমার বারণ রইল।

* *

যযাতি দেবযানীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। পরম সুখে রাজারানীর দিন কাটতে লাগল।

আর শর্মিষ্ঠা ?

যযাতি শর্মিষ্ঠাকে অশোক বনে আলাদা বাড়ি তৈরী করিয়ে দিলেন। রাজকুমারী সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি ছেলে হল। রাজ্যে খুব ধুমধাম পড়ে গেল।

শর্মিষ্ঠা কিন্তু সে খবর পেয়ে বড় মনমরা হয়ে গেলেন।

তাঁর মনে হল, দেবযানী কেমন সুখী, আর তাঁর জীবনটা যেন চির-আঁধারে ভরা। দুনিয়াতে তাঁর কোন আশাই ত মিটল না!

হঠাৎ এই সময়ে মহারাজ একদিন অশোক বনে বেড়াতে এলেন।

শর্মিষ্ঠা তাঁকে ডেকে বললেন, মহারাজ, আমার

প্রণাম নিন। আপনি ত জানেন, আমার রাজকুলে জন্ম। দয়া করে আমাকে বিবাহ করুন।

রাজা যযাতি গোপনে তাঁকে বিবাহ করলেন। দেবযানী কোন কথা জানতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে শর্মিষ্ঠার কোল আলো করে এল এক দেবশিশু।

ক্রমে সব খবর দেবযানীর কানে গেল।

তিনি মনের জ্বালায় অশোক বনে ছুটে এলেন। শর্মিষ্ঠাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, তুমি আমার দাসী হয়ে এই সর্বনাশ করলে! তোমার মনে কি ভয় বলে কিছু নেই?

রাজার উপর দেবযানীর ভয়ানক অভিমান হল। তিনি ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে যযাতিকে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, মহারাজ। আপনি একি হীন কাজ করলেন? আপনার উপর যে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল! এর পর আর ত আপনার রাজপুরীতে থাকতে পারব না। আমি চললুম।

দেবযানী বুকভরা কান্না নিয়ে বাবার কাছে ফিরে গেলেন। রাজাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন।

শুক্র মেয়ের কষ্ট দেখে বড় অধীর হয়ে উঠলেন। যযাতির উপর তাঁর ভয়ানক রাগ হল।

তিনি রাগের মাথায় অভিশাপ দিলেন। বললেন, যযাতি, তুমি এমন কাজ করলে ? আমি শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করতে তোমাকে না গোড়াতেই বারণ করে দিয়েছিলুম। তুমি সে কথা মাননি। তোমাকে শাপ দিই, তোমার দেহ এখনি মহাজরায় ভরে যাক।

রাজার খুব কষ্ট হল। একি কঠোর শাপ! এর পর আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন।

কিন্তু শুক্রাচার্য কিছুতেই টললেন না, কঠোরভাবে বসে রইলেন।

শেষে যযাতি মিনতি করে বললেন, ভগবান, আজও যে আমি ভোগের ভিখারী। ভোগের কামনায় আমার মন ভরে আছে। দয়া করে এমন কোন উপায় বলে দিন, যাতে আমি এই অকাল জরার হাত থেকে রেহাই পাই।

শুক্র জবাব দিলেন, আমার মুখ থেকে যে শাপ একবার বেরিয়ে গেছে, তা ত আর ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। তবে একটা কথা বলি, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অপরকে দিতে পারবে।

যযাতি চরম অন্ধকারের ভিতর একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। এতেই তাঁর মনে খুশি উপচে পড়ল। তিনি গদ্‌গদভাবে বললেন, ভগবান, প্রণাম নিন। আমার

কোন ছেলে যাতে এই জরা নেয়—তার চেষ্টা করব। যে ছেলে আমাকে তার যৌবন দেবে, সে যেন আমার সিংহাসন পায়—এই অনুমতি দিন।

শুক্র বললেন, তাই হবে।

*

*   *

যযাতি রাজপুরীতে ফিরে এলেন। ভোগের কামনায় মন তাঁর আকুল। তাই অকাল জরার ভারে ইতিমধ্যেই পাগল হয়ে উঠেছেন।

তিনি বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা, শুক্রের শাপে অকালে জরা পেয়েছি। কিন্তু আমার জীবনে ভোগের বাসনা এখনও মেটেনি। তুমি কি আমার এই জরার ভার নেবে, আর তোমার যৌবন আমাকে দেবে? আমি হাজার বছর ধরে জীবন ভোগ করব। তারপর ফিরিয়ে দেব তোমার যৌবন।

বড় ছেলে রাজী হলেন না।

যযাতি তখন অপর অপর রাজকুমারদের এক এক করে নিজের কাছে ডাকালেন। বললেন, আমার জীবনে ভোগের বাসনা এখনও মেটেনি। তুমি কি আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দেবে? হাজার বছর পরে ফিরিয়ে দেব তোমার যৌবন।

তাঁরাও কেউ রাজাকে যৌবন দিতে রাজী হলেন না।

মনমরা মহারাজ যযাতি শেষে ছোটছেলে পুরুকে ডেকে পাঠালেন।

পুরু সব শুনে বললেন, বাবা, আপনাকে আমার যৌবন দিতে রাজী আছি।

—আর আমার জরা?

পুরু শান্তভাবে জবাব দিলেন, আমাকে দিন আপনার জরার ভার।

ছেলের কথা শুনে রাজার মন চরম খুশিতে উতলে উঠল। তিনি আবেগে গদ্‌গদ হয়ে বললেন, ধন্য তুমি। ধন্য তোমার পিতৃভক্তি। আমার আশিস্‌ নাও।

দেখতে দেখতে ঘোর বদল ঘটে গেল। যযাতির দেহ নবযৌবনের আলোয় টলমল করতে লাগল।

তিনি নতুন উৎসাহে চরম ভোগে মেতে উঠলেন। আর পুরু অকাল জরার ভারে নুয়ে পড়লেন। তাঁর গাল তুবড়ে গেল, গায়ের চামড়া কুঁচকে উঠল। দাঁত হল ফোকলা, মাথায় পড়ল টাক।

একে একে হাজার বছর কেটে গেল। যযাতি এই হাজার বছর ধরে মনের সুখে যৌবন ভোগ করলেন। তবু তাঁর বাসনা মিটল না।

কিন্তু তিনি নিজের কথার খেলাপ হতে দিলেন না। ঠিক সময়ে ছোটছেলেকে ডেকে পাঠালেন।

বুড়ো পুরু থপ থপ করে টলতে টলতে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

যযাতি বললেন, বাবা পুরু।

—কি বলছেন, মহারাজ ?

যযাতি জবাব দিলেন, দেখো, তোমার যৌবন পেয়ে হাজার বছর মনের সুখে বিষয় ভোগ করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি, ভোগের শেষ নেই। ভোগ যেন আগুনে ঘি ঢালার মত। যতই ভোগ করা যায়, ততই ভোগের কামনা বেড়ে চলে। তাই বলি, জীবনে বিষয় বাসনা ত্যাগ করাই সেরা পথ।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, বাবা, এবার ফিরে নাও তোমার যৌবন। আর তার সঙ্গে নাও আমার সিংহাসন।

শকুন্তলা

মহারাজ দুষ্মন্তের জন্ম পুরুবংশে। তিনি ছিলেন মহাবীর। সসাগরা ধরণী ছিল তাঁর অধীনে। রাজার গুণে প্রজারা পরম সুখে কাল কাটাতেন।

একদিন রাজা বনে শিকার করতে চললেন। সঙ্গে চলল হাতি ঘোড়ার দল। আর চলল অস্ত্রধারী সেনারা।

রাজা রাজপথ দিয়ে যাবার সময় ঘরে ঘরে শাঁখ বাজতে লাগল। নগরবাসিনীরা ছাদে উঠে তাঁর মাথায় ফুল ছড়িয়ে দিলেন। প্রজারা জয় দিতে দিতে নগরের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলেন।

সেখান থেকে রাজা সোনার রথে চড়ে গভীর বনের দিকে রওনা হলেন।

রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের হাতে বনের পশু অনেক মারা পড়ল। তবু রাজার ক্লান্তি নেই।

তিনি শেষে একটা হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন এক নতুন বনে। সেখানে গাছে গাছে ফুল ফুটেছিল। মধুর গন্ধে দিক-বিদিক ভরে গেছল।

ছোট একটি নদী। নাম মালিনী। সেই নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম।

আশ্রমের এদিকে ওদিকে বেড়াতে বেড়াতে দুষ্মন্তের কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি আনমনে আরও এগিয়ে চললেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল মহর্ষি কণ্বের কুটীর। তিনি কুটীরের কাছে এসে ডাকলেন, ভিতরে কে আছ?

একজন মুনির মেয়ে বার হয়ে এলেন। তিনি তরুণী। সুঠাম, দীঘল তাঁর দেহের গড়ন। মুখে মধুর হাসি। মেয়েটি রাজাকে পাদ্য দিলেন, অর্ঘ দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি চান?

রাজা জবাব দিলেন, আমি মহর্ষি কণ্বকে প্রণাম করতে এসেছি।

মেয়েটি বললেন, বাবা ফল আনতে বনের ভিতরে গেছেন। আপনি একটু বসুন।

মেয়েটিকে দেখে রাজার মনে জাগল পরম মোহ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মহামুনি ত বিয়ে করেননি। আপনি কি করে তাঁর মেয়ে হলেন?

শকুন্তলা রাজাকে তাঁর জন্মের কাহিনী বললেন। তাঁর বাবার নাম বিশ্বামিত্র। মার নাম মেনকা। মেনকা জন্মের পর কচি মেয়েটিকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে রেখে স্বর্গে ফিরে যান। তিনি যে স্বর্গের অপ্সরী। পাখিরা দল বেঁধে সেই কচি মেয়েটিকে রক্ষা করতে

থাকে। মহামুনি কণ্ব ভোরবেলা নদীতে নাইতে গিয়ে তা দেখতে পান। তিনি করুণাবশে মেয়েটিকে কুড়িয়ে এনে আশ্রমে পালন করতে লাগলেন।

কাহিনী শেষ করে শকুন্তলা হাসতে হাসতে বললেন, পাখিরা আমায় রক্ষা করেছিল, তাই বাবা আমার নাম রেখেছেন শকুন্তলা।

রাজা বললেন, তুমি ত দেখছি রাজকুমারী। তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী হও। তুমি যা চাও, তাই দেব। আমি রাজা দুষ্মন্ত।

শকুন্তলা জবাব দিলেন, মহারাজ, একটু বসুন। বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করলে অধর্ম হবে। তিনিই আমার সব। ফিরে এলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন।

রাজার মনে জেগেছিল দুরন্ত বাসনা। শকুন্তলাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল।

বনের মধ্যে এমন কনক চাঁপা ফুলের মত মেয়ে দেখতে পাবেন, তা তিনি কোনদিন আশা করেননি।

তিনি আর দেরি করতে রাজী হলেননা, শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করলেন।

শকুন্তলা বিয়ের আগে রাজাকে বললেন, আগে কথা দিন, আমার ছেলে আপনার রাজ্যের যুবরাজ হবে।

রাজা তখনি রাজী হলেন। বললেন, ওগো সুন্দরী, তুমি যা বললে, তাই হবে।

কণ্বের আশ্রমে ফিরতে দেরি হতে লাগল। রাজা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না।

তিনি বিদায় নেবার সময় শকুন্তলাকে বার বার বলে গেলেন, শকুন্তলে, তোমার ভয় নেই। এখন আমি যাচ্ছি। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি, তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাব।

তারপর তিনি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহামুনি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন। তিনি শকুন্তলাকে আনমনা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ কি মা?

তারপর তিনি ধ্যানবলে সব ঘটনা জানতে পারলেন।

শকুন্তলা কাতরভাবে বললেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় রাজাকে বিয়ে করেছি। তিনি কোন রকম জোর করেন নি। আপনি যেন তাঁর উপর রাগ করবেন না।

মহামুনি জবাব দিলেন, না মা। আমি রাজার উপর একটুও রাগ করিনি।

তিনি খুশীমনে আশিস্ জানালেন, পুরুবংশে সকলেরই ধর্মে মন থাকবে। তাঁরা কখনও নিজেদের রাজ্য হারাবেন না। তাঁদের দিন দিন উন্নতি হবে।

যথাসময়ে শকুন্তলার একটি ছেলে হল। সবল, সুন্দর, সুঠাম। যে তাকে দেখে, সেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এমনি তার সারা দেহ আলোয় ভরা।

মহামুনি কণ্ব ছেলেটিকে আশ্রমে রেখে লালন-পালন করতে লাগলেন।

ছ বছর বয়সের সময় সে পরম শক্তিধর হয়ে উঠল। বাঘ, বরাহ, হাতি ধরে এনে আশ্রমের গাছে গাছে বেঁধে রাখতে লাগল।

মহামুনি একদিন শকুন্তলাকে বললেন, মা, তোমার ছেলের এবার যুবরাজ হবার সময় হয়েছে যে। শকুন্তলা চুপ করে রইলেন। কণ্ব তখন বলতে লাগলেন, আর ত তোমার আশ্রমে থাকা উচিত নয়। রাজা তোমার কোন খবর না রাখলেও তোমার নিজে থেকে তাঁর কাছে যাওয়া দরকার।

কণ্ব শিষ্যদের সঙ্গে দিয়ে শকুন্তলা আর তাঁর ছেলেকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

*

* *

শিষ্যেরা দুষ্মন্তের রাজধানীতে এসে শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

শকুন্তলা বনের সরলা মেয়ে। তিনি রাজসভায় ঢুকে রাজাকে সোজাসুজি জানালেন, মহারাজ, এই আপনার ছেলে। আমার গর্ভে এর জন্ম। বিয়ের সময় আপনি আমাকে যে কথা দিয়েছিলেন, তা মনে আছে ত? সেই কথামত এখন এই ছেলেকে যুবরাজ করুন।

দুষ্মন্ত সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরল না।

তারপর তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি কি সব বাজে বকছ, দুষ্টু তাপসী? আমার ত কোন কথাই মনে পড়ছে না। তোমার সঙ্গে কি আমার কখন দেখা হয়েছিল?

রাজার কথা শুনে রাগে শকুন্তলার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে শুরু করলে।

তিনি অতিকষ্টে বললেন, মহারাজ সব জেনে শুনেও আপনি ইতর লোকের মত মিথ্যা কথা বলছেন কেন? সত্য কথা বলুন। আমার বাবা মহামুনি

কণ্ব। তিনি যোগবলে সব জানতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনি তাঁর কাছে কোন কথাই লুকোতে পারবেন না।

দুষ্মন্ত পাথরের মত কঠিন হয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে শকুন্তলা রাগ সামলে নিলেন।

তিনি নরম স্বরে অনুরোধ করলেন, মহারাজ, আপনি যদি আমাকে না চান, আমি না হয় বাবার আশ্রমে ফিরে যাব। কিন্তু আপনার এই ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন। নিজের সন্তানের ভার আপনি নিন। একে ত্যাগ করা আপনার মত মহাজনের পক্ষে উচিত কাজ হবে না।

দুষ্মন্ত এবার কঠোর স্বরে বললেন, মিথ্যে কথা বলা মেয়েমানুষদের স্বভাব। দুষ্টু তাপসী, দূর হও এখান থেকে।

শকুন্তলা অপমানে অধীর হয়ে উঠলেন।

তিনি আর কোন কথা না বলে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

হঠাৎ সভার লোকেরা একটা অজানা আওয়াজ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাণী হল, মহারাজ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা সত্য কথাই বলছে। এই সন্তান

তোমার। তুমি একে যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করো। এর নাম হোক ভরত।

চকিতে রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন।

তাঁর মুখের রেখায় রেখায় কঠোরতা দূর হল। তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা আকাশ-বাণী শুনলেন ত? এই শিশু আমার। আমি সেকথা জানতুম। কিন্তু যদি কেবল শকুন্তলার কথায় ওকে সন্তান বলে মেনে নিতুম, তাহলে প্রজারা দোষ দিত। এখন আর কোন বাধা রইল না।

রাজা পরম ভালবাসায় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর শকুন্তলাকে রানী বলে গ্রহণ করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ

বিভাণ্ডক মুনি। তাঁর ছেলে ঋষ্যশৃঙ্গ।

হরিণীর গর্ভে জন্ম হয় ঋষ্যশৃঙ্গের। তাঁর মাথার উপরে ছিল একটি শিং।

বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল নির্জন বনমধ্যে। কৌশিক নদীর তীরে। জন্মাবধি ঋষ্যশৃঙ্গ বাবার আশ্রমেই

মুনির আশ্রম

থাকতেন। তপ-তপস্যায় তাঁর দিন কাটত। তিনি ছিলেন কঠোর ব্রহ্মচারী। বাবা ছাড়া সংসারের আর কোন মানুষকে তিনি দেখেন নি।

সেকালে লোমপাদ ছিলেন অঙ্গদেশের রাজা।

তিনি ব্রাহ্মণদের পীড়ন করতেন, পুরোহিতদের দেখতে পারতেন না। তাই তাঁরা অঙ্গদেশ ছেড়ে অপর দেশে চলে গেছলেন।

শেষে ইন্দ্রও রাজার উপর বিরক্ত হলেন। লোমপাদের রাজ্যে জলবর্ষণ করা বন্ধ করে দিলেন। দেশজুড়ে অজন্মা দেখা দিল। প্রজাদের ভয়ংকর কষ্ট হতে লাগল।

তখন একজন মুনি এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমার কথা শুনুন। আপনি প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের শান্ত করুন। আর যেমন করে পারেন মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে নিয়ে আসুন। তিনি এলেই বৃষ্টিপাত হবে।

নিরুপায় লোমপাদ মুনির কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হলেন।

কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গকে কি করে অঙ্গদেশে আনা যায়? রাজা কোন উপায় ঠিক করতে পারলেন না।

শেষে মন্ত্রীর মন্ত্রণায় রাজবাড়িতে নগরের যত তরুণা নটীদের ডাক পড়ল। রাজা তাদের বললেন, তোমরা যে উপায়ে পার, ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এস।

তারা প্রস্তাব শুনে খুব ভয় পেলে। বললে, মহারাজ, মুনির শাপে যে আমাদের সর্বনাশ হবে। আপনি মাপ করবেন, এমন কাজ আমাদের দিয়ে হবে না।

রাজা হতাশ হয়ে পড়লেন।

নটীদের মধ্যে ছিল একজন বুড়ী। তখন সে এগিয়ে এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, বললে, মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি, মুনিকে এনে আপনার কাছে হাজির করব।

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি?

—হ্যাঁ, মহারাজ। আমার যা যা দরকার, তা আমাকে দিতে আদেশ করুন।

বুড়ী যা যা চাইলে, রাজা সব দিলেন। উপরন্তু অনেক টাকাকড়ি দিলেন।

বুড়ী একটি কাঠের নৌকো কৃত্রিম গাছপালা, লতা-পাতা, আর ফুল ফল দিয়ে পরিপাটি করে সাজালে। সেই কাঠের নৌকোটিকে দেখতে হল একটি মুনির আশ্রমের মত।

তার মধ্যে লুকিয়ে রইল নগরের সেরা কয়েকজন তরুণী নটী। বুড়ীর মতলব মত সেই নৌকোটিকে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের কাছে এনে নদীতীরে বেঁধে রাখা হল।

বিভাণ্ডক তখন আশ্রমে ছিলেন না। বুড়ীর মেয়ে সেই সুযোগে আশ্রমের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সোজা এসে হাজির হল তরুণ যুবা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। তারপর ভক্তিভরে বললে, ঋষি, আমার প্রণাম নিন। আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন ত? ফলমূল পাবার অসুবিধে হচ্ছে না? আপনার বাবার তপ-সাধনায় ত বাধা ঘটছে না? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, ব্রহ্মচারী, আপনার দেহে কি চমৎকার জ্যোতি! আপনি আমার পূজনীয়। আপনাকে পাদ্যঅর্ঘ এনে দিই। আপনি এই কৃষ্ণাজিনে-ঢাকা আসনে বসুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি কি তপের সাধনা করছেন?

নটী উত্তর দিলে, এই সামনে যে পাহাড়, তার পিছনে আমাদের আশ্রম। আমি ত কারোর কাছ থেকে পাদ্যঅর্ঘ নিই না। আপনিই আমার পূজনীয়। আমার ব্রত অনুযায়ী আপনাকে আলিঙ্গন করব।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, তবে এই ফলমূল নিন। আপনার খুশিমত খান।

নটী কিন্তু ঋষির দেওয়া আমলকী আর অন্যান্য ফলমূল কিছুই ছুঁল না। সে ঋষিকে চমৎকার চমৎকার সুস্বাদু খাদ্য আর পানীয় খেতে দিলে, মধুগন্ধী ফুলের

মালা আর রেশমী ধুতিচাদর পরতে দিলে। তারপর নানা হাসি-তামাশা করতে করতে তাঁর সঙ্গে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তরুণী নটীর জানা ছিল নানা ছলাকলা। সে কখন লতার মত এঁকেবেঁকে অপরূপ ছন্দে অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। কখন খেলার ছলে ঋষির গায়ে ঢলে পড়ে আদর জানালে। কখন-বা গভীর আবেগভরে তাঁকে বার বার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

যুবক ঋষ্যশৃঙ্গের চিত্তবিকার ঘটল। তাঁর মুখে চোখে ভেসে উঠল লালসার আগুন।

নটী ঋষিকে মত্ত-দশায় দেখে খুব খুশী হল। তারপর ছল করে বললে, এখন হোমের সময় হল। আজ তবে আসি, ঋষি।

ঋষ্যশৃঙ্গ আকুল হয়ে বললেন, না, না, মুনি। আর কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকুন।

নটী তখন জোর করে বিদায় নিলে।

*

*   *

ঋষ্যশৃঙ্গ একা একা বসে ভাবতে থাকেন। তাঁর দেহ মোহে আতুর। মন বিহ্বল। ভাবনার মধ্যে ঘুরে ফিরে

কেবলই জাগে অপরূপ অতিথির কথা। বুক থেকে বেরিয়ে আসে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।

এমন সময় ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এলেন।

তিনি ছেলের ভাবগতিক দেখে অবাক। বললেন, বাবা, একি ব্যাপার! আজ তুমি যজ্ঞের কাঠ জোগাড় করনি? হোমের আয়োজন করনি? দুধ দোওনি? তোমাকে আগের মত দেখছি না কেন? তুমি যেন কি এক ভয়ংকর ভাবনায় পড়েছ। কে আজ আশ্রমে এসেছিল?

ঋষ্যশৃঙ্গ আনমনাভাবে উত্তর দিলে, আজ আশ্রমে একজন জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। খুব লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। দেখতে যেন দেবতা। সোনার মত তাঁর রং, পদ্মফুলের মত টানাটানা চোখদুটি। মাথায় তাঁর ঘন কাল রঙের লম্বা জটা, সোনার দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার গলায় দুলছিল একটা কি যেন চমৎকার জিনিস। কটিদেশ সরু। তাঁর পরনের ভিতর দিয়ে সোনার মেখলা দেখা যাচ্ছিল। আর হাতে পায়ে ছিল আমার জপের মালার মত মালা—মিষ্টি শব্দভরা। কোকিলের মত মধুর গলার স্বর। তাঁর কথা শুনলে মন আপনা থেকে অজানা খুশিতে ভরে ওঠে। সেই দেবকুমারকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি আমাকে

বারবার আলিঙ্গন করেছিলেন। কি এক চমৎকার জল খেতে দিয়েছিলেন। তা খেয়ে মনে হয়েছিল, যেন পৃথিবী চারিদিকে ঘুরছে। আর দেখুন, তিনি কি সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা রেখে গেছেন! বাবা, তিনি চলে যাবার পর আমার বড় খারাপ লাগছে। গা যেন আগুনের মত জ্বলছে। আমি তাঁর কাছে যাব। দুজনে আমরা একসঙ্গে সাধনা করব।

বিভাণ্ডক বললেন, বাবা, ওরা রাক্ষস। অদ্ভুত রূপ ধরে মুনিদের কাছে আসে। যাতে আমাদের সাধনা পণ্ড হয়। ওদের দিকে তাকানো সাধকদের উচিত নয়। ওর কাছ থেকে যে জল খেয়েছ, তাকে মদ বলে। তা বদ লোকে খায়। মুনিদের তা খাওয়া পাপ। আর এইসব ফুলের মালা পরাও আমাদের উচিত নয়।

*

*　　*

বিভাণ্ডক আশ্রমের চারিদিকে নটীদের খুঁজে বেড়ালেন। তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন ফলমূল জোগাড় করার আশায় আবার আশ্রম ছেড়ে বনে চলে গেলেন।

বুড়ীর মেয়ে সেই অবসরে পুনরায় চুপি চুপি এসে হাজির হল।

ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে দেখতে পেয়ে অজানা খুশিতে মাতাল হয়ে উঠলেন। আকুল হয়ে বললেন, ব্রহ্মচারী, আমার বাবা বাইরে গেছেন। চলুন, এইবেলা আপনার আশ্রমে যাই।

নটী তাঁকে তাড়াতাড়ি নানা কৌশলে ভুলিয়ে নৌকোয় নিয়ে এল। তারপর সোজা এসে হাজির হল অঙ্গদেশে।

রাজা লোমপাদ ঋষিকে পরম আদরে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবাড়িতে পা দেবামাত্র আকাশে ঘন কালো মেঘের উদয় হল। দেশময় ঝরঝর ধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। রাজার কামনা সফল হল।

লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন।

নলদময়ন্তী

রাজার নাম নল। তিনি নিষধ দেশের রাজা ছিলেন। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদার। আর অসাধারণ রূপবান। সারা দুনিয়াতে অশ্ববিদ্যায় তাঁর জোড়া ছিল না। কিন্তু মহাবীরের একটি দোষ ছিল। তিনি পাশাখেলার নেশা দমন করতে পারতেন না।

সে সময়ে বিদর্ভদেশে রাজত্ব করতেন রাজা ভীম। তাঁর একটি মেয়ে ছিল, নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী ছিলেন খুব রূপবতী। সুরপুরের দেবতারাও তাঁর রূপের প্রশংসা করতেন।

একটি দেশের রাজপুরী থেকে আর একটি দেশের রাজপুরীতে নিত্য লোকজন যাতায়াত করত। তাদের মুখে নল শুনতে পেলেন দময়ন্তীর কথা। আর দময়ন্তী শুনতে পেলেন নলের কথা। এইভাবে দূরের দময়ন্তীর উপর নলের মন পড়ল। আর দময়ন্তীর হৃদয়ে জাগল নলের উপর ভালবাসা।

কিছুদিন পরে রাজা নলের মনের ভিতর এক অজানা অসুখ হল। সংসারে কিছুই যেন ভাল লাগে না। তিনি রাজপুরীর কাছাকাছি একটি উপবনে একাকী বাস করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন সেখানে অঘটন

ঘটল। রাজা তখন নিরালায় বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন, কতকগুলি সোনার রঙের হাঁস চরছে। তিনি কৌতূহল বশে একটি হাঁসকে ধরে ফেললেন।

হাঁসটি বললে, মহারাজ আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমি আপনার মনের মত একটি কাজ করে দেব।

—কি কাজ ?

হাঁস জবাব দিলে, রাজকুমারী দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার গুণের কথা বলব। এমন করে বলব যাতে তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোন পুরুষকে কামনা করবেন না।

নল খুশী হয়ে হাঁসকে ছেড়ে দিলেন।

হাঁস ছাড়া পেয়ে সদলবলে বিদর্ভে গেল। দময়ন্তী আর তাঁর সখীরা চমৎকার হাঁসগুলিকে দেখতে পেয়ে ধরবার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলেন।

—শুনুন, রাজকুমারী।

দময়ন্তী যে হাঁসটিকে তাড়া করেছিলেন সে হঠাৎ নিরালা জায়গা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এই কথা বললে।

রাজকুমারী ত হাঁসের কথা শুনে অবাক।

হাঁস বলে চলল, নিষধদেশের রাজা যিনি, নাম তাঁর নল। দুনিয়ায় তাঁর মত সুন্দর কেউ নেই। তাঁর

গুণের তুলনা হয় না। আপনি যেমন সব বিষয়ে সেরা, তিনিও তেমনি। আপনাদের দুজনের সঙ্গে মিলন খুব সুখের হবে।

দময়ন্তী আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি গদগদ্‌ভাবে বললেন, হাঁস, যাও। এইসব কথা রাজা নলের কাছে গিয়ে বলে এস।

হাঁস আবার প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে নিষধদেশে এল, নলকে সব খবর দিলে।

দিন যায়। ক্রমে রাজকুমারীর মনে জাগল বিরহ। তাঁর শরীর রোগা হতে লাগল, গায়ের রং কালি হয়ে গেল। তিনি সদাই নল রাজার কথা ভাবতে থাকেন। তাঁর চোখের ঘুম গেল, মনের সুখ নষ্ট হল।

রাজা ভীম মেয়ের দশা দেখে উতলা হলেন। তাঁর মনে হল, এবার দময়ন্তীর বিবাহ দেওয়া দরকার। তিনি অচিরে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন।

রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে দূর দূর থেকে রাজারা বিদর্ভে এসে হাজির হলেন। কেউ এলেন হাতি চড়ে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ রথে।

দময়ন্তীর স্বয়ংবরের খবর শুনে দেবতারাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম বিদর্ভে যাত্রা করলেন।

পথে তাঁরা নলকে দেখতে পেলেন। তাঁরা নলের অসাধারণ রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের মনে দময়ন্তীকে পাবার আশা নিভে গেল। তাই তাঁরা একটি ফন্দী আঁটলেন।

দেবতারা নলের সামনে এসে বললেন, রাজা, তুমি দূত হয়ে আমাদের একটি কাজ করে দাও।

নল জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ, করব। কিন্তু আপনারা কে ?

ইন্দ্র বললেন, আমরা স্বর্গের দেবতা। দময়ন্তীকে বিয়ে করার আশায় মাটির দেশে নেমে এসেছি। তুমি তাকে গিয়ে বলো যে, দেবতারা তাকে চান। সে যেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ আর যম—এই চারজনের মধ্যে একজনকে বরণ করে।

নল বললেন, আমিও যে তাকে বিয়ে করতে চাই। নিজেই যখন চাইছি, তখন আর একজনের জন্য কি করে বলি ? মাপ করুন, এ দূতগিরি আমাকে দিয়ে হবে না।

দেবতারা নলকে কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, সে কি কথা ! তুমি যে আমাদের দূতগিরি করবে বলে আগেই কথা দিয়েছ। এখন না বললে তোমার কথা দিয়ে কথা খেলাপ করার পাপ হবে। না, না, রাজা।

তুমি যাও। আমরা তোমাকে বর দিচ্ছি। তার বলে তুমি রাজপুরীর ভিতরে বিনা বাধায় যেতে পারবে, একেবারে সোজা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে হাজির হবে।

তখন নল দেবতাদের আদেশ মত বিদর্ভ দেশের রাজপুরীতে গেলেন। দময়ন্তী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আপনার দেহে কি চমৎকার সোনার রঙের আলো। আমার মন কেড়ে নিতে কেন এখানে এসে হাজির হলেন?

নল জবাব দিলেন, রাজকুমারী, আমার নাম নল। চারজন দেবতার দূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি। সেই দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ আর যম। তুমি এঁদের ভিতরে যে কোন একজনকে স্বামী বলে বরণ করো।

রাজকুমারী জবাব দিলেন, আমি যে আপনার। আমার যা কিছু আছে, সবই আপনার।

নল বললেন, অমর দেবতারা থাকতে মর মানুষকে চাইছ কেন, রাজকুমারী?

দময়ন্তীর চোখ দুটি জলে ভরে এল। তিনি বললেন, দেবতাদের প্রণাম করি। কিন্তু রাজা শুনুন। আমি আপনার। দেবতাদের সঙ্গে আপনিও স্বয়ংবর

সভায় আসবেন। তাঁদের সামনেই আপনার গলায় মালা দেব।

রাজা ফিরে গিয়ে দেবতাদের সব কথা জানালেন।

*

* *

মহারাজ ভীম শুভদিনে মেয়ের স্বয়ংবর সভা ডাকলেন। দেশ দেশ থেকে রাজারা সেই সভায় এসে হাজির হলেন।

দময়ন্তী একে একে সব রাজা আর রাজকুমারদের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগলেন। তাঁর হাতে মালা আর চন্দন। ভাটেরা আপন আপন রাজার মহিমার কথা কীর্তন করতে লাগল। দময়ন্তীর কারোকে পছন্দ হল না।

শেষে তিনি দেখতে পেলেন, সভায় এখনো পাঁচজন পুরুষ বাকী রয়েছেন। তাঁদের চেহারা একই রকম। এঁদের ভিতরে কে নল—কেমন করে বোঝা যাবে ?

তখন নিরুপায় দময়ন্তী কাতরভাবে মনে মনে দেবতাদের কাছে জানাতে লাগলেন, আমি অবুঝ, অবোধ। আপনাদের শরণ নিলুম। দয়া করে আপনাদের ঠিক ঠিক রূপ আমায় দেখিয়ে দিন।

দেবতারা খুশী হলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেবচিহ্ন ধারণ করলেন। দময়ন্তী বুঝতে পারলেন, পাঁচজনের ভিতরে যাঁর দেহে দেবচিহ্ন নেই, তিনিই রাজা নল। তিনি নলের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

দেবতারা খুশী হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, মরণের পর তোমার পরম গতি হবে। অগ্নি বললেন, তুমি যেখানে চাইবে, সেইখানে আমি হাজির হব। যম বর দিলেন, তুমি যা রাঁধবে, তাই হবে সেরা খাবার। আর চিরকাল ধর্মে তোমার মন অচল থাকবে। বরুণ বর দিলেন, তুমি যেখানে জল চাইবে, সেখানেই জল পাওয়া যাবে।

তারপর নল দময়ন্তীকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। পরম সুখে তাঁদের দিন কাটতে লাগল। তাঁদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হল। ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনা।

*

* *

এদিকে হঠাৎ এক বিপদ ঘটল। কলির নজর ছিল দময়ন্তীর উপর। সেই দময়ন্তী দেবতাদের ছেড়ে একজন মানুষকে বিয়ে করেছেন শুনে তাঁর ভয়ংকর

রাগ হল। তিনি নলের অপকার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

নলের একজন ভাই ছিলেন, নাম পুষ্কর। কলি পুষ্করের কাছে ছুটে এলেন। তাঁকে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে পাশা খেলার আয়োজন কর। ভয় কি? আমি তোমার সহায় হব। তুমি নিষধদেশের সিংহাসনে বসবে।

পুষ্কর লোভী ছিলেন। তিনি রাজ্যলাভের লোভে নতুন উৎসাহে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। পাশা খেলার

নল কেবলই হারতে লাগলেন

সব আয়োজন করে ভাইকে ডাক দিলেন। পাশা খেলায় নলের ছিল দারুন নেশা। তিনি তখনি খেলতে বসলেন।

কিন্তু খেলায় বারবার অঘটন ঘটল। নল কেবলই হারতে লাগলেন।

তিনি যত বাজী রাখলেন, সব পুষ্কর জিতে নিলেন। একে একে তাঁর সব টাকাকড়ি, ধনসম্পত্তি গেল। তবু তাঁর খেলার নেশা কাটল না।

তখন মন্ত্রী ছুটে এলেন। প্রধান প্রধান পাত্রমিত্র ছুটে এলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে দময়ন্তী এসে হাজির হলেন। সকলের মুখে এক কথা, রাজা একি করছেন! এবার খেলা বন্ধ করুন।

নলের শরীরে যে কলি আগে থেকে ঢুকে তাঁকে মোহে বেহুঁশ করে ফেলেছিলেন। তাই রাজা কারোর মানা শুনলেন না। খেলার নেশায় আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন।

শেষে তিনি রাজ্যও হারালেন।

পুষ্কর হেসে বললেন, দাদা আপনার সর্বস্ব গেছে। এখন একমাত্র দময়ন্তী বাকী আছেন। যদি চান এবার তাঁকেই পণ রাখুন।

মহাবীর নলের বুক কেঁপে উঠল। তাঁর মোহ দূর হল। তিনি নিজের দুর্দশার কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু আর ত কোন উপায় ছিল না!

নল হাতের পাশা ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

রাজ্যধন সব ছেড়ে কেবল একখানি কাপড় পরে পথে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীও পরনের শাড়ীখানি সম্বল করে স্বামীর সঙ্গিনী হলেন।

প্রজারা হাহাকার করতে লাগল। তা দেখে পুষ্করের রাগের সীমা রইল না। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, কোন প্রজা নলদময়ন্তীকে সাহায্য করতে পারবে না। করলে কঠোর সাজা পাবে।

নিঃসম্বল রাজারানী নগরের বাইরে তিন রাত বাস করলেন। ভয়ে প্রজারা কেউ তাঁদের মুখে অন্নজল দিতে এল না।

*

* *

তিন দিন উপবাসের পর নল খাবার খোঁজে বনের ভিতরে ঢুকলেন। তিনি হঠাৎ পথে এক ঝাঁক সোনার রঙের পাখি দেখতে পেলেন। ভাবলেন, পাখিগুলোকে শিকার করে খাবার আয়োজন করা যাবে। এই ভেবে যেই তিনি পরনের ধুতিখানি খুলে পাখিগুলোর উপর চাপা দিয়েছেন, অমনি পাখিগুলো কাপড়শুদ্ধ ফুড়ুক করে আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল। আকাশে উড়তে উড়তে বললে, নল, যা নিয়ে তুমি সেদিন খেলা করছিলে, আমরা সেই পাশার দল। তোমার সব

গেছে। বাকী ছিল একখানি ধুতি। আমরা সেটুকুও হরণ না করে সুখ পাচ্ছিলুম না।

নল দুঃখে নুয়ে পড়লেন। তিনি মনমরা হয়ে দময়ন্তীর কাছে এসে বললেন, যাদের মায়াজালে পড়ে সব খুইয়েছি, এবার তারা আমার শেষ সম্বল ধুতিখানিও নিয়ে নিলে। আমার জীবনে আর কোন আশাভরসা দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলি, দময়ন্তী, তুমি তোমার বাবার কাছে চলে যাও। সামনের এই যে পথ, এই পথ বিদর্ভে গেছে।

স্ত্রী বললেন, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। তবে যদি তুমি আমার সঙ্গে বাবার কাছে যেতে চাও, তাহলে যেতে রাজী আছি।

নল জবাব দিলেন, আগে যেখানে রাজা হয়ে গেছলুম, আজ পথের ভিখারী হয়ে সেখানে কেমন করে যাই, বল ?

শেষে দময়ন্তীর পরনের শাড়ীখানি স্বামীস্ত্রী দুজনে ভাগ করে পরে বনের ভিতরে যাত্রা করলেন। ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে গেল। তাঁরা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে একটি নিরালা জায়গায় বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে দময়ন্তীর চোখদুটি অবসাদে জড়িয়ে এল। তিনি মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

নল বসে বসে নিজের কুদশার কথা ভাবতে লাগলেন। কলির মায়ায় আবার তিনি মনের জোর হারালেন। তিনি ঘুমন্ত দময়ন্তীর শাড়ীর আধখানা কেটে ফেললেন। তারপর গহন বনের ভিতরে স্ত্রীকে একা ফেলে চুপিচুপি পালালেন।

*

* *

ঘুম ভাঙলে দময়ন্তী সব বুঝতে পারলেন। দারুণ দুঃখে তাঁর চোখদুটি দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। পাগলিনীর মত আপন মনে বার বার বলতে লাগলেন, হায়, হায়, রাজা, একি করলেন ? আমাকে বনের মধ্যে ছেড়ে কোথায় আপনি চলে গেলেন ?

তিনি কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর খোঁজে বনের ভিতরে ঢুকলেন। হঠাৎ এক বিকট অজগর এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি ভয়ে আঁতকে উঠলেন।

তাঁর কাতর চিৎকার শুনে একজন ব্যাধ পাশের ঝোঁপ থেকে ছুটে এল। তারপর খড়্গ দিয়ে অজগরটিকে কেটে ফেললে।

ব্যাধ রানীকে জল এনে দিলে। খাবার খেতে দিলে। তারপর দময়ন্তীর শরীর একটু ভাল হলে

জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁগা মেয়ে, হরিণের মত তোমার চোখ, তুমি কে? এই গহন বনে কি করতে এসেছ।

রানী সব কথা বললেন। সেই গল্প শুনতে শুনতে ব্যাধের মনে কুমতলব জাগল। সে দময়ন্তীকে ধরতে গেল।

দুর্বল রানীর চোখ দুটিতে জ্বলে উঠল প্রলয়ের আগুন। তিনি শাপ দিলেন, আমি যদি সতী হই, যদি মহারাজ নল ছাড়া অপর কোন পুরুষকে কোনদিন চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই শয়তানের এখনি মরণ হোক।

ব্যাধ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

দময়ন্তীর জীবনে একটি বিপদ গেল, আবার বিপদ ঘটল। তবু তিনি নলকে খুঁজে পাবার আশা ছাড়লেন না। পুনরায় গহন বনে এগিয়ে চললেন।

বিশাল সেই অরণ্য। সারি সারি বড় গাছ। কোথাও শাল, অশ্বত্থ, অর্জুন। কোথাও বট, পিয়াল, তাল। কোথাও পাহাড়। কোথাও দুরন্ত নদী। বনের দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত বুনো জানোয়ার। সিংহ, বাঘ, হাতি। ভাল্লুক, মহিষ, বরাহ। গাছে গাছে পাখিদের হাট বসেছে। মানুষের বসতির কোথাও চিহ্ন পাওয়া যায় না।

দময়ন্তী কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে বনের শেষে এসে হাজির হলেন। সামনে হঠাৎ জেগে উঠল এক চমৎকার তপোবন। সেখানে নানা মুনির বাস। মুনিরা দময়ন্তীর পাগলিনী বেশ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, তুমি কে? কেঁদ না। এখানে কেন এসেছ, বল।

দময়ন্তী বললেন, আমি বিদর্ভদেশের রাজকুমারী। রাজা নল আমার স্বামী। তিনি মহাবীর, পরম সাধক। তাঁর রূপের তুলনা নেই। আজ তিনি সব হারিয়ে পথের ভিখারী হয়েছেন। আমি তাঁর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন রাখব না।

মুনিরা বললেন, মা, তোমার ভয় নেই। তুমি অচিরে স্বামীর দেখা পাবে। তিনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন।

মুনিরা কথা বলতে বলতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। দময়ন্তী খুব অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম? মুনিরা কোথায় লুকোলেন?

*

*　　*

আশা মরেও মরে না। দময়ন্তী নতুন আশায় বুক

বাঁধলেন। আবার স্বামীর খোঁজে বনের পথে যাত্রা করলেন।

পথের মাঝে একটি নদী পড়ল। একদল বণিক সেই নদী পার হচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একদল হাতি আর ঘোড়া। দময়ন্তী তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা এক বিরাট তড়াগের তীরে এসে পৌঁছলেন। সকলে ঠিক করলেন, এখানেই আজকের রাতটা কাটানো যাক।

মাঝ রাতে এক অঘটন ঘটল। যখন বণিকেরা গভীর ঘুমে অচেতন, তখন একদল বুনো হাতি জল খেতে সেখানে এল। তারা বণিকদের তাঁবুতে পোষা হাতিগুলোকে দেখে খুব রেগে গেল। রাগের ভরে পাগল হয়ে তাঁবু আক্রমণ করলে। নিমেষের ভিতরে চারিদিকে হৈহৈ, রৈরৈ শুরু হয়ে গেল। বণিকেরা অনেকেই আহত হল, কেউ কেউ মারা গেল।

বুনো হাতির দল চলে গেলে বণিকেরা কাঁদাকাটি করতে লাগল। তাঁদের যত রাগ গিয়ে পড়ল দময়ন্তীর উপর। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, ঐ যে পাগলী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, ও মানুষ নয়, পিশাচী। আমরা ওকে আজ শেষ করে তবে ছাড়ব।

দময়ন্তী আড়াল থেকে সে আলোচনা শুনলেন। তাঁর মনে খুব কষ্ট হল। তিনি বার বার বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, আমি জীবনে কখনো কারোর অপকার করিনি। তবে আজ আমার এ দশা হল কেন ?

বণিকদের দলে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। দময়ন্তী অপর কোন উপায় না দেখে তাঁদের শরণ নিলেন। তাঁরা ছিলেন বড় দয়ালু। বললেন, তোমার ভয় নেই। আমাদের সঙ্গে চল। এই বলে তাঁরা দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন।

কিছুদিন পরে মহারাজ সুবাহুর রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন। তখন বিকাল বেলা। মহারাজার মা রাজ-প্রাসাদের ছাদে উঠেছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন, দূরে একজন বিদেশিনী পাগলীর পিছনে একদল ছেলে হৈহৈ করছে। তাঁর মন কেঁদে উঠল। তিনি দাসীকে ডেকে বললেন, ঐ যে দূরে মেয়েটি পথে পথে ঘুরছে, যত ছেলের দল ওর পিছু নিয়েছে। তুমি ওকে রাজপুরীতে ডেকে আন।

দাসী গিয়ে দময়ন্তীকে রাজবাড়ির ভিতরে নিয়ে এল। মহারাজার মা জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি ?

দময়ন্তী জবাব দিলেন, আমার জন্ম ভাল বংশে।

আমি পতিব্রতা মেয়ে। ছাত্রী পেলে শিল্প কাজ শিখিয়ে রোজগার করে খাই।

—কার স্ত্রী তুমি?

দময়ন্তী আবেগের সঙ্গে বললেন, আমার স্বামীর গুণের সীমা নেই। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমিও ছিলুম তাঁর ছায়ার মত। কিন্তু কপালগুণে আমার একদিন সর্বনাশ হল। আমার অমন স্বামী পাশা খেলায় সব হারিয়ে বনবাসী হলেন। আমি এখন তাঁর খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রাজার মা বললেন, মা, আমার কাছে তুমি থাকো। আমার লোকেরা তোমার স্বামীর খোঁজ করবে। হয়ত-বা একদিন তোমার স্বামী ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

দময়ন্তী আশ্রয় পেয়ে খুশী হলেন। বললেন, রানীমা, আপনার খুব দয়া। আমি আপনার আশ্রয়ে থাকব। কিন্তু আমার কয়েকটা নিয়ম আছে। সেগুলো যাতে পালন করতে পারি, তার হুকুম দিন। আমি কারোর এঁটো জিনিস খাব না, কারোর পা ধুইয়ে দেব না। যে লোকেরা আমার স্বামীর খোঁজে যাবেন, শুধু তাঁদের সঙ্গে দেখা করব। অপর কোন পুরুষের

সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে কামনা করে, আপনি তাকে প্রাণদণ্ড দেবেন।

—বেশ, যা বললে, তা সব মেনে নিলুম।

রাজার মা তখন নিজের মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। রাজকুমারীর নাম সুনন্দা। তিনি মেয়েকে বললেন, এই যে দেবীর মত মেয়েটিকে দেখছ, এ তোমার সমবয়সী। আজ থেকে এ তোমার সখী হল। সুনন্দা খুশী মনে দময়ন্তীকে নিজের পুরীতে এনে রাখলেন।

*

* *

এদিকে নলও সুখে ছিলেন না।

তিনি যখন ঘুমন্ত দময়ন্তীকে ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে হনহন করে যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় দেখতে পেলেন, আগুন জ্বলছে। তাঁর কানে এল, সেখান থেকে কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

রাজা সাহসভরে আগুনের কাছে গেলেন। তাঁর চোখে পড়ল একটি নাগ। নাগ হাত জোড় করে বললেন, মহারাজ, আমাকে আপনি চেনেন না। আমার নাম কর্কোটক নাগ। একদিন নারদমুনিকে ঠকিয়েছিলুম। তিনি তাই আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এইখানে মরার মত হয়ে পড়ে থাক।

রাজা নল যখন তোমাকে অপর জায়গায় নিয়ে যাবেন, তখন এই শাপ কেটে যাবে। আজ আপনি এই বনে এসেছেন। আমাকে তুলে দিয়ে চলুন। আমার শাপ কেটে যাক।

নাগ কথা বলতে বলতে খুব ছোট হয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে তুলে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। তিনি যেই দশ পা এগিয়ে গেছেন, অমনি নাগ তাঁকে কামড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নলের চেহারা একেবারে বদলে গেল।

নাগ নিজের আসল মূর্তি ধরলেন। বললেন, মহারাজ, কিছু মনে করবেন না। লোকে যাতে আপনাকে চিনতে পেরে আপনার ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্য আপনার চেহারা বদলে দিলুম। যে কলির শয়তানিতে আপনার আজ এই দশা হয়েছে, সেই কলি এখন আমার বিষে জ্বরজ্বর হয়ে খুব কষ্টে আপনার শরীরে বাস করবে। আপনি এক কাজ করুন। অযোধ্যায় যান। সেখানকার রাজার নাম ঋতুপর্ণ। তাঁর কাছে গিয়ে ছদ্মবেশে থাকুন। আপনি বলবেন, আমার নাম বাহুক সারথী। আমি আপনাকে অশ্ববিদ্যা শেখাব। আর তার বদলে আপনি আমাকে পাশাখেলার গোপন-বিদ্যা শেখাবেন।

তারপর নাগ নলকে একখানি কাপড় দিলেন। বললেন, আপনার যখন নিজের মূর্তি ফিরে পাবার ইচ্ছে হবে, আমাকে মনে করে এই কাপড় পরবেন।

নাগ শাপমুক্ত হয়ে চলে গেলেন।

দশদিন পরের কথা। নল ঋতুপর্ণের কাছে এসে হাজির হলেন। ছদ্মবেশী তাঁকে কেউ চিনতে পারলে না। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম বাহুক। দুনিয়াতে ঘোড়াচালনার কাজে আমার সমান কেউ নেই। রান্নার কাজও আমার খুব ভাল জানা আছে।

ঋতুপর্ণ তাঁকে গুণী বলে খুব আদর করলেন। বললেন, আমার কাছে তুমি থাক। তোমাকে আমার অশ্বশালার ভার দিলুম। আমার দুজন পুরোতন সারথী আছে। তাদের নাম বার্ষ্ণেয় আর জীবল। তারা তোমার সেবা করবে।

নল রাজপুরীর অশ্বশালায় কাজ করতে লাগলেন। তাঁর কোন অভাব রইল না। রাজার আদেশে সকলেই তাঁকে খাতির করে চলত। নল সারাদিন কাজের ভিতরে খুব ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর দুঃখের কথা ভাববার সময় পেতেন না। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার মাটির দেশে নামলেই তাঁর মন হু-হু করে কেঁদে উঠত।

তিনি দময়ন্তীর কথা ভেবে কাতর হয়ে পড়তেন। রোজ নিজের মনে এই কথাগুলি আবৃত্তি করতেন, হায়, হায়, কে জানে আজ সেই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, অবসাদে ভেঙে-পড়া দুঃখিনী কোথায় শুয়ে আছে! এই অভাগাকে স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে!

জীবল রোজ সেই আবৃত্তি শুনতে পেত। একদিন সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, বাহুক, আপনি কার কথা মনে করে রোজ আবৃত্তি করেন?

বাহুকের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনি জবাব দিলেন, কি আর বলব? একজন অভাগা কোন কারণে তার আদরিণী স্ত্রীকে বনের ভিতরে ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যা হলেই মনে পড়ে সেই দুঃখিনীর কথা। তাই আবৃত্তি করি। না জানি, আজ কোথায় আছে সেই অবলা নারী।

*

* *

কালক্রমে মহারাজ ভীম মেয়ে জামাইএর দুর্দশার কাহিনী শুনলেন। তাঁর বড় কষ্ট হল। তিনি তাঁদের খোঁজে নানাদেশে লোক পাঠালেন।

তাঁর পাঠানো একজন ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে চেদি দেশে এসে হাজির হলেন। নাম সুদেব। তখন

সেখানকার রাজপুরীতে যজ্ঞ হচ্ছিল। সুদেব রাজপুরীর যজ্ঞসভায় হঠাৎ দেখতে পেলেন দময়ন্তীকে। তিনি চমকে উঠলেন। ভাবলেন, সেই পরমাসুন্দরী রাজকুমারীর একি দশা হয়েছে! এ যেন ভরা পূর্ণিমার চাঁদকে রাহুতে খেয়েছে!

সুদেব নিরালায় দময়ন্তীকে বললেন, রাজকুমারী, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনাদের খোঁজে বিদর্ভ থেকে আসছি। আপনার ভায়ের বন্ধু। আপনার বাবা মা, ছেলেমেয়ে সকলে ভাল আছেন।

দময়ন্তী সে খবর শুনে উতলা হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

সুনন্দা দূর থেকে তা দেখতে পেলেন। তিনি তখনি মাকে গিয়ে সব খবর দিলেন।

রাজার মা তিলমাত্র দেরি না করে সেখানে এসে হাজির হলেন। সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে, ঠাকুর?

সুদেব সব গল্প বললেন।

রাজার মা জিজ্ঞাসা করলেন, তা ইনিই যে সেই দময়ন্তী, তার প্রমাণ কি?

সুদেব বললেন, ওঁর দুই ভ্রূর মধ্যে পদ্মফুলের মত একটি জটুল আছে, দেখতে পাবেন।

স্বামীর ভাবনায় দময়ন্তী সাজসজ্জা করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেহে পুরু ময়লা জমেছিল। সুনন্দা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন, সযত্নে তাঁর কপালের ময়লা সাফ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই জটুল চিহ্ন।

আর কোন সন্দেহ করার সুযোগ রইল না। হঠাৎ রাজার মার অনেকদিনের পুরাতন কথা মনে পড়ল। তিনি দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মা, তোমার মা আর আমি যে দশার্নদেশের রাজার মেয়ে। আমাদের বাপের বাড়িতে তোমার জন্ম হয়। তখন এই জটুল দেখেছিলুম, মনে পড়ছে।

দময়ন্তীর চোখে আবার জল নামল। তিনি আবেগভরে বললেন, আমার ছেলেমেয়েকে অনেকদিন দেখিনি। আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন, বিদর্ভে পাঠিয়ে দিন।

সুবাহু সব শুনে খুশী হলেন। তিনি তখনি লোকজন সঙ্গে দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে দময়ন্তীর বাবামার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর দময়ন্তী বাবাকে বললেন, আমাকে যদি বাঁচাতে চান, তাহলে আমার স্বামীকে খুঁজে বার

করুন। রাজা তখনি সব আয়োজন করলেন। তাঁর আদেশে একদল ব্রাহ্মণ আবার দেশে দেশে যাত্রা করলেন।

দময়ন্তী ব্রাহ্মণদের ডেকে বলে দিলেন, যেখানে লোক সমাগম দেখবেন, সেখানেই বার বার চেঁচিয়ে বলবেন, হে শঠ, আপনার স্ত্রী আজও আপনাকে ছাড়া আর কিছু জানে না। আপনি আধখানা কাপড় কেটে নিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে বনের ভিতরে ফেলে কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন? আপনার স্ত্রী সেই আধখানি কাপড় পরে আজও আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। রাজা দয়া করে জবাব দিন। দময়ন্তী আরও বললেন, আপনাদের এই কথাগুলি শুনে যদি কোথাও কেউ জবাব দেন, তাহলে সব খবর জেনে এসে আমাকে বলুন।

দিন যায়। রাত ঘনায়। আবার ভোরের আলো আকাশে রঙিন হয়ে ওঠে। দময়ন্তী একটি একটি করে দিন গোনেন আর তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ে।

—আজ কি কোন খবর পাওয়া গেল?

মহারাজ ভীম রোজই ছলছল চোখে জানান, না।

তারপর হঠাৎ একদিন একজন ব্রাহ্মণ ফিরে এসে বললেন, রাজকুমারী, আপনার কথাগুলি ঋতুপর্ণ রাজার সভায় গিয়ে চিৎকার করে বলি। কিন্তু কেউ কোন

জবাব দিলেন না। তারপর ফিরে আসছি, এমন সময় রাজার একজন সারথি আমাকে নিরালায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে দেখতে খুব কদাকার। তার হাত দুটি বেঁটে-বেঁটে। তবে শুনলুম, রথ চালাতে আর রান্না করতে তার জোড়া নেই। সে ছলছল চোখে বললে, সতীরা বিপদে পড়লেও নিজের জোরে নিজেকে রক্ষা করেন। পাখিতে যার কাপড় টেনে নিয়ে গেছল, সেই নিরুপায় অভাগা স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছে বটে। কিন্তু সতী তাতে রাগ করে না।

দময়ন্তী আনন্দের আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

তিনি মাকে একে একে সব কথা জানালেন। তারপর বললেন, তুমি এখন বাবাকে কিছু বলো না। আমি সুদেবকে একবার অযোধ্যা দেশে পাঠিয়ে দিই। দময়ন্তী সুদেবকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর অনুরোধে সুদেব অযোধ্যা যাত্রা করলেন। দময়ন্তী বলে দিলেন, আপনি অযোধ্যায় গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে জানাবেন, দময়ন্তী আবার স্বয়ংবরা হবেন। কাল সকালে নতুন স্বামীর গলায় মালা দেবেন। অনেক রাজা আর রাজকুমার স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। আপনার ইচ্ছে হয়, আপনিও চলুন।

সুদেব অযোধ্যায় গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর মুখে

ঋতুপর্ণ স্বয়ংবর সভার খবর শুনলেন। তখন তিনি বাহুককে ডেকে বললেন, কাল বিদর্ভে রাজকুমারী দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা। তুমি কি রথে করে একদিনের মধ্যে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে?

চকিতে নল উতলা হয়ে উঠলেন। এও কি সম্ভব! দময়ন্তী হবে আবার স্বয়ংবরা! ছেলেমেয়ে রয়েছে, তবু সে আবার বিয়ে করবে? তিনি মনের ভাবনা বাইরে প্রকাশ করলেন না। নিজেকে চেপে রেখে জবাব দিলেন, হ্যাঁ মহারাজ, একদিনের মধ্যেই আপনাকে রথে করে বিদর্ভে নিয়ে যেতে পারব।

—বেশ। তাহলে এখনি রথ সাজাও।

নল অশ্বশালা থেকে বেছে বেছে কয়েকটি ঘোড়া নিলেন। ঘোড়াগুলি দেখতে ছিল রোগা। ঋতুপর্ণ রথের ঘোড়াগুলির চেহারা দেখে রাগ করলেন। বললেন, বাহুক, একি করেছ? আমার সঙ্গে কি তামাশা করছ? এই রোগা রোগা ঘোড়াগুলো কেন জুড়েছ? এদের দিয়ে কি হবে? নল জবাব দিলেন, মহারাজ, এই ঘোড়াগুলোর কপালে মাথায় আর মুখের দুপাশে দশটি করে রোমাবর্ত আছে। এদের মত ছুটতে অপর কোন ঘোড়া পারবে না। এরা সিন্ধুদেশের ঘোড়া। তাই এদের বেছে নিয়েছি।

রাজা ঋতুপর্ণ আর কোন কথা বললেন না। তাড়াতাড়ি রথে উঠলেন। নল বার্ষ্ণেয় সারথিকে সঙ্গে নিলেন। তারপর মহাবেগে আকাশ পথে রথ ছোটালেন। দেখতে দেখতে কত না নদনদী, বন, পাহাড় পিছনে পড়ে রইল। রথ হু-হু করে আরও এগিয়ে চলল। রথের ভিতরে যেন ঝড় বইতে লাগল।

হঠাৎ এক সময়ে রাজার গায়ের চাদর উড়ে গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন, বাহুক, রথ থামাও। চাদর উড়ে গেছে যে। বার্ষ্ণেয় গিয়ে চাদর কুড়িয়ে আনুক। নল বললেন, নিমেষের ভিতরে আমরা যে এক যোজন পথ এগিয়ে এলুম। এখন গিয়ে কি আর চাদর খুঁজে পাওয়া যাবে?

রাজা সে কথা শুনে অখুশী হলেন। তিনি নিজের বিদ্যা দেখাবার উদ্দেশে বললেন, বাহুক, সামনে এই যে বহেড়া গাছ দেখছ, এই গাছ থেকে মাটিতে একশ একটি পাতা পড়েছে, ফলও একশ একটি পড়েছে। এর দুটি ডালে আছে পাঁচ কোটী পাতা আর দুহাজার পঁচানব্বইটি ফল। তুমি গুনে দেখ, ঠিক কিনা।

বাহুক বললেন, তাহলে রথ থামিয়ে গাছটি কেটে পাতা আর ফল গুনে দেখি? ঋতুপর্ণ মুশকিলে পড়লেন। বললেন, না, না। রথ থামিওনা। তাহলে স্বয়ংবর সভায়

পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। বরং যত তাড়াতাড়ি পার, এগিয়ে চল। যদি আজ সূর্যাস্তের আগে বিদর্ভ দেশে পৌঁছতে পার, তাহলে তুমি যা চাইবে, তা-ই দেব।

নল রথ থামাবার জন্য জেদ করতে লাগলেন।

তখন রাজা বললেন, শোন, এক কাজ করা যাক। আমি ডালের একটি অংশে পাতা আর ফল কত আছে, তা বলছি। তুমি গুনে দেখো, মেলে কিনা।

নল গাছের ডালের টুকরো কেটে হিসাব করে দেখলেন। ঠিক ঠিক মিলে গেল। রাজা যতগুলি পাতা আর ফলের কথা বলেছিলেন, ততগুলি পাতা আর ফল ডালে ছিল। নল খুব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি অনুনয় করে বললেন, মহারাজ, আপনার কি চমৎকার শক্তি। দয়া করে আমাকে এই গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে দিন। তার বদলে আমি আপনাকে অশ্ববিদ্যা শেখাব।

রাজা ঋতুপর্ণ খুশী হয়ে নলকে পাশাচালার বিদ্যা শেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে কলি কর্কোটক নাগের বিষ বমি করতে করতে নলের দেহ থেকে বার হয়ে এলেন। তবে নল ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখতে পেলে না। নলের চোখ দুটি রাগে জ্বলতে লাগল।

কলি বললেন, রাজা নল, আমাকে যেন শাপ দেবেন না। আমার বরে আপনার কীর্তি অমর হয়ে থাকবে।

দুনিয়াতে যে লোক আপনার নাম কীর্তন করবে তার কলি ভয় থাকবে না। তারপর কলি বহেড়া গাছের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেলেন।

নলেরা সন্ধ্যার আগে বিদর্ভে পৌঁছিলেন।

আকাশে রথের গুরুগর্জন ধ্বনি হচ্ছিল। দময়ন্তী সেই আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন। ভাবলেন, নল রাজা ছাড়া আর কারোর রথে এমন ত আওয়াজ হয় না। নিশ্চয়ই এই রথে নল আসছেন।

মহারাজ ভীম কিছুই জানতেন না। অতিথিকে খুব আদর করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ আসার কারণ কি হল, রাজা? ঋতুপর্ণ ভাবলেন, স্বয়ংবর সভার ত কোন আয়োজন দেখছিনা। নিশ্চয়ই কোথাও কোন বোঝার গলদ হয়েছে। তিনি নিজের মনের কথা চেপে গেলেন। ফিকির করে বললেন, অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই দেখা করতে এসেছি। ভীম খুব খুশী হলেন। তাঁর আদেশে প্রাসাদের লোকেরা ঋতুপর্ণকে অতিথিশালায় নিয়ে গেলেন। বাহুক রথশালায় গিয়ে ঘোড়াদের খাবার খেতে দিলেন।

দময়ন্তী কেশিনী দাসীকে ডেকে বললেন, রথ-শালায় একজন বেঁটে, কদাকার অতিথি এসেছে, তার

পরিচয় নিয়ে এস ত। কেশিনী চুপি চুপি নলের কাছে এলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, আপনারা কেন এখানে এসেছেন ? নল জবাব দিলেন, তোমাদের রাজকুমারীর আবার স্বয়ংবর হবে শুনে আমরা এসেছি। কেশিনী জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কে ? নল বললেন, আমি অযোধ্যার রাজার সারথি। তাঁর রান্নাও করি। কেশিনী আবার জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের রাজার সঙ্গে আর একজন যিনি এসেছেন, তিনি কে ?

—তার নাম বার্ষ্ণেয়। সেও অযোধ্যার রাজার সারথি। সে আগে নল রাজার সারথি ছিল।

তখন কেশিনী বললে, রাজা নল এখন কোথায় আছেন, তা কি বার্ষ্ণেয় জানে ? নল জবাব দিলেন, না। সেও জানেনা, অপর কেউও জানেনা। আমি শুধু এইটুকু জানি, নলের চেহারা বদলে গেছে। তিনি ছদ্মবেশে ছদ্মনামে বেঁচে আছেন।

দময়ন্তী কেশিনীর মুখে সব কথা শুনলেন। তাঁর মনের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন, কেশিনী, তুমি বাহুকের কাছে আবার যাও। চুপিচুপি দেখে এস, তাঁর কাজকর্ম আচরণে কোন বিশেষ লক্ষণ আছে কিনা। কেশিনী আবার গেল। তারপর ফিরে এসে বললে, রাজকুমারী, বাহুকের মত এমন সদাচারী লোক

কখনো দেখিনি। ইনি ছোট দরজা দিয়ে ঢোকবার সময় মাথা নীচু করেন না। দরজাই দরকার মত উঁচু হয়ে যায়। আমাদের রাজা মহারাজ ঋতুপর্ণের সেবার জন্য মাংস পাঠিয়েছিলেন। রান্নাঘরে মাংস ধোবার খালি কলসী ছিল। বাহুক চোখ তুলে তাকাতেই কলসীগুলি জলে ভরে গেল। তিনি সেই জলে মাংস ধুয়ে নিলেন। তারপর একমুঠো শুকনো ঘাস হাতে তুলে নিয়ে সূর্যের ধ্যান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রান্নার জন্য ঘাসগুলোতে আগুন ধরে উঠল।

দময়ন্তীর হৃদয়ে নতুন আশা জাগল। তিনি দাসীকে বললেন, তুমি আবার যাও। তাঁকে না জানিয়ে তাঁর রাঁধা একটু মাংস নিয়ে এস।

কেশিনী মাংস নিয়ে এল। দময়ন্তী তা চেখে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, এ নলের রাঁধা মাংস।

তিনি এবার দাসীর সঙ্গে ছেলে আর মেয়েকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নল সন্তানদের দেখে উতলা হয়ে উঠলেন। তিনি আবেগ ভরে তাঁদের কোলে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। কিছু পরে তাঁর হুঁশ হল। এবার ত ধরা পড়ে যাব! তিনি তখন মনে মনে এক ফিকির করলেন। চোখের জল মুছে কেশিনীকে বললেন, জানো, এদের

মত আমার দুটি ছেলেমেয়ে আছে কিনা। তাদের ফেলে রেখে এসেছি। এদের দেখে সেই ছেলেমেয়ের জন্য মন কেমন করে উঠেছিল। তাই কাঁদছিলুম। তা একটা কথা বলি, বাপু। আমরা বিদেশী লোক। তোমাদের রাজবাড়িতে অতিথি হয়েছি। তুমি বারবার আমার কাছে এমন করে এস না। কে জানে, লোকে হয়ত দোষ ধরবে। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে এখন যাও।

দময়ন্তী কেশিনীর মুখে সব শুনলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুমানই ঠিক। ইনি রাজা নল ছাড়া আর কেউ নন। তিনি বাবা আর মাকে ডেকে বললেন, আমার বিশ্বাস, এই বাহুকই রাজা নল। তবে একটা কথা আছে। বাহুকের বিশ্রী চেহারা। সেজন্য যা একটু মনে সন্দেহ রয়েছে। আমি একবার বরং তাঁকে কাছ থেকে পরীক্ষা করে আসি। তোমরা হুকুম দাও।

রাজা ও রানী খুশী মনে আদেশ দিলেন।

রাজকুমারী নিজের ঘরে বাহুককে ডাকিয়ে আনালেন। নল দেখতে পেলেন, বিরহিণী দময়ন্তীর মাথায় জট, শরীর শীর্ণ, রং কালি। পরনে বিবাগিনীর বেশ। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গেল। রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাহুক, ঘুমন্ত স্ত্রীকে একলা

বনের ভিতরে ফেলে রেখে চলে যায়—এমন কোন ধার্মিক পুরুষকে আপনি জানেন কি ?

নল জবাব দিলেন, আমায় মাপ করো। যার জন্য আমি রাজ্য হারিয়েছি, সেই কলির প্রভাবেই তোমাকে ত্যাগ করেছিলুম। কলি তোমার শাপে পুড়ে আমার দেহের মধ্যে বাস করছিল। এখন আমি তাকে জয় করেছি, আমার পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে করেছ কেন ?

দময়ন্তী জোড় হাত করে বললেন, রাজা, তুমি একথা বলো না। তুমি কি ভুলে গেছ, আমি দেবতাদের ছেড়ে তোমার গলাতেই মালা পরিয়ে দিয়েছিলুম ?

আবেগে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। কিছু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তোমার খোঁজে দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছিলুম। সবাই হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। শেষে একজন এসে তোমার অযোধ্যায় থাকার কথা জানালেন। তখন তোমাকে এখানে আনাবার আশায় স্বয়ংবরের কথা মিথ্যে করে রটিয়ে দিয়েছি। মনে আমার কোন পাপ নেই। আর যদি আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তাহলে হে সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, তোমরা এখনি আমার প্রাণ নাও।

আকাশে অজানা আওয়াজ শোনা গেল। বায়ু

বললেন, রাজা নল, আমি বলছি, দময়ন্তীর কোন পাপ হয়নি। এখন তোমাদের মিলন সুখের হোক।

তখন ফুল-বৃষ্টি হতে লাগল। দেবলোকে দুন্দুভি বেজে উঠল। রাজা নল নাগের দেওয়া কাপড় পরতেই আগেকার রূপ ফিরে পেলেন।

তাঁদের দুজনের মন মিলন সুখে ভরে গেল।

*

* *

এক মাস খুব আনন্দে কাটল। তারপর রাজা নল আর রানী দময়ন্তী নিজেদের রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সঙ্গে গেল ভীম রাজার সেনাদল।

নল ছোট ভাই পুষ্করকে বললেন, আমি অনেক টাকাকড়ি উপায় করেছি। এস আবার পাশা খেলা যাক। আমার সব কিছু ধন আর স্ত্রী দময়ন্তীকে পণ রাখছি। তুমি তার বদলে রাজ্য পণ রাখ। কি বল ?

পুষ্কর চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

নল আবার তাঁর পণের কথা বললেন। তারপর একটু থেমে কথা শেষ করলেন, আর দেখ, যদি পাশা খেলায় রাজী না হও, তবে এস দুজনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি।

পুষ্কর হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,

দেখছি, অদৃষ্টের দয়ায় আবার কিছু টাকাকড়ি করে আপনার খুব গুমোর বেড়েছে। আসুন, পাশা খেলা যাক। অচিরে আপনার যথাসর্বস্ব জিতে নেব। সুন্দরী দময়ন্তীকেও ছাড়ব না।

চকিতে নলের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। তাঁর ইচ্ছে হল, এখনি শয়তানের মাথা কেটে দুখানা করে ফেলেন। কিন্তু তিনি রাগ দমন করলেন। ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা, এস, খেলা যাক। তারপর দেখা যাবে, কে হারে, কে জেতে।

খেলা শুরু হল। রাজা নল এক পণেই ভায়ের সর্বস্ব জয় করে নিলেন। পুষ্কর মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

নল বললেন, হতভাগা, তোমার বড় গুমোর হয়েছিল, না? এবার হাতেহাতে ফল পেলে ত। যাহোক, তুমি ছোট ভাই। তোমার সব অপরাধ মাপ করলুম। তোমার নিজের যা কিছু ছিল, এই ফেরত নাও।

ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বিদুলা

বিদুলা ছিলেন ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। বড় তেজস্বিনী। তাঁর ছেলের নাম সঞ্জয়। সঞ্জয় ছিলেন এক দেশের রাজা।

এক সময়ে সিন্ধুদেশের রাজার সঙ্গে সঞ্জয়ের খুব লড়াই হয়। সঞ্জয় মহাবীর ছিলেন। তিনি প্রাণপণে লড়াই করলেন। কিন্তু শত্রুকে দমন করতে পারলেন না। তাঁর হার হল।

তিনি রাজ্য হারিয়ে হতাশ মনে দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন বিদুলা ছেলেকে নিরাশভাবে শুয়ে থাকতে দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। বললেন, বাবা, তোমাকে আমার সন্তান বলে মনে হচ্ছে না। যুদ্ধে একবার হেরে গেছ বলে তুমি কি সারা জীবন হতাশ হয়ে কাটাতে চাও? কীর্তি ছাড়া ক্ষত্রিয়ের জীবনের কোন দাম নেই। তুমি সে কীর্তি হারিয়ে বেঁচে রয়েছ কি বলে? ওঠ, জাগ, আবার জ্বলে ওঠ, বীরের মত শত্রুকে আক্রমণ করো।

সঞ্জয় বললেন, মা, তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি বলছ, আমার উচিত ছিল, হয় লড়াই-এ জয়লাভ করা, না হয় মরা। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তোমার

কাছে ফিরে আসা ঠিক হয়নি। কিন্তু ধরো যুদ্ধক্ষেত্রে আমার যদি মরণই হত, তাহলে সন্তান হারিয়ে সারা পৃথিবী পেয়েও তোমার কি লাভ হত? তাছাড়া, মানুষের জীবনে এত চেষ্টা করে জয়লাভ করার কি দাম, তা বুঝতে পারছি না। জীবনে টাকাকড়ি, নাম-প্রতিপত্তি, সুখভোগ করে শেষ পর্যন্ত কি পাওয়া যায়?

মা জবাব দিলেন, মানুষের মত বাঁচাই সত্যিকার বাঁচা। শুধু যাহোক করে দিন কাটানোয় না আছে সুখ, না-বা আনন্দ। যে নিজের বাহুবলে জীবনধারণ করে, সে অমর কীর্তির অধিকারী হয়। তার পরলোকে সংগতি লাভ হয়। শোন বাবা, শুনেছি, সিন্ধুরাজার প্রজারা তাঁর উপর খুশী নয়। কিন্তু তারা দুর্বল। তাই রাজার বিপদ কবে হবে, সেই আশায় বসে আছে। তুমি যদি বীর্যবানের মত উঠে দাঁড়াও, তারা হয়ত তোমার সহায় হবে। তাছাড়া, অপরাপর রাজাও সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যুদ্ধে তোমার জয় হবে, কি পরাজয় হবে—সে ভাবনা না করে যুদ্ধে লাগো। আমি বীরের বংশে জন্মেছি, বীরের বংশে আমার বিয়ে হয়েছে। তুমি আমার সন্তান। দীন-হীনভাবে আর বসে থেকো না। তুমি ক্ষত্রিয়। শত্রুকে দমন করতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুখ লাভ করে, তা

ইন্দ্রপুরীতে বাস করলেও পাওয়া যায় না। যাও বাবা, যুদ্ধ করে হয় শত্রুকে মার, না-হয় নিজে মর। ক্ষত্রিয়ের এ ছাড়া শান্তি নেই।

সঞ্জয় বললেন, মা, তোমার মন কালো পাষাণে তৈরী। তাই আমাকে এমন ভাবে গঞ্জনা দিতে পারছ। আমার টাকাকড়ি নেই, সহায় নেই। আমি যুদ্ধে কি করে জয়লাভ করব? এই দুরবস্থার কথা বিচার করেই যুদ্ধে আমার মন লাগছে না।

বিদুলা জবাব দিলেন, তুমি বীরের মত একবার যুদ্ধ করেছ। আবার তেমনি বীরের মত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার জয়লাভ হবেই। সিন্ধুরাজের উপর যাদের রাগ আছে, যাদের তিনি অপমান করেছেন, তাদের সঙ্গে ভাব করো। তারা নিশ্চয়ই তোমার সহায় হবে। যে উদ্যোগী, যে আশাবাদী, তার কখনো কিছুর অভাব হয় না। বাবা, আর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থেকোনা। জাগো, যুদ্ধের আয়োজন করো।

সঞ্জয় মায়ের উৎসাহে মনোবল ফিরে পেলেন। তিনি অচিরে যুদ্ধে গেলেন। এবার তাঁর জয় হল। তিনি নিজের রাজ্য ফিরে পেলেন।

॥ শেষ ॥